উত্তর-আধুনিকতা ও ফোকলোর

আরমিন হোসেন

ঐতিহ্য

আতিজা দীল আফরোজ
শ্রদ্ধাভাজনেষু

সূচনা-কথন

পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে, বদলাচ্ছে মানুষের যাপিত জীবনের ধরন। লোকমননে নির্মিত হচ্ছে নয়া আখ্যান। পৃথিবী, জীবন, সংস্কৃতি শব্দ তিনটি আক্ষরিক অর্থে ভিন্ন হলেও যেন অকৃত্রিম সংযোগ রয়েছে। প্রতিবেশিক প্রভাবে যাপিত জীবনে নানান মাত্র যুক্ত ও বিযুক্তের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের পালের হাওয়া বিশ্বকে দোল দেবে না কী করে হয়। আজ আমরা যা দেখছি বিশ বছর আগে যেমন তা একইরূপ ছিল না, তেমনি ২০ বছর পরও এরূপটা থাকবে না। পরিবর্তনই জগৎ, পরির্বতনই চিরন্তন সত্য। তবু কোথায় যেন শেকড়ের টান বরাবরই মানবজাতি নাড়া দেয়। এ যেন নাড়ির টান। কোথাও যেন পরম্পরার প্রতিচ্ছবি ঈষৎ হলে দ্রষ্টব্য হয়।

অভিজ্ঞতা ও চিন্তার জায়গা যদি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বলি, তবে তা কখনো নিরপেক্ষ নয়। বর্তমানে যেকোনো বিদ্যায়তনিক শাখার গবেষণার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ভিন্ন মাত্রা সৃজন করেছে। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন মতবাদ প্রদানের সাথে সাথেই তা বিভিন্ন জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োগ হতে শুরু করে। সেদিক থেকে গবেষকবৃন্দ তত্ত্বের আলোকে পৃথিবীকে দেখতে বেশি পছন্দ করেন এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। কেননা জ্ঞান হলো প্রেক্ষিতনির্ভর এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত। উত্তর-আধুনিকতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একটি বিষয়ে সর্বজনের মত রয়েছে যে, এটি অনেকগুলো তত্ত্বের সমষ্টি যা নিশ্চয়ই আধুনিকতা নয়। বরং আধুনিকতার ধারণার বিপরীত কিছু বোঝায়। আধুনিকতা যেখানে কেন্দ্রর মহাআখ্যান নির্মাণ করে গিয়েছে, উত্তর-আধুনিকতা তার উল্টো পথে কেন্দ্রকে দেখিয়েছে। হতে পারে কেন্দ্র বহু অথবা কেন্দ্র বলতে কিছুই নেই। উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের মতে, একক কেন্দ্র বলতে কিছু নেই। প্রান্ত বারংবার কেন্দ্র প্রাপ্ত হতে পারে। উত্তর-আধুনিকতা গবেষকের নিরেট সত্য প্রতিষ্ঠার বিপরীত কিছুকে বোঝায়। অর্থাৎ সত্য আপেক্ষিক, বস্তুনিরপেক্ষ নয়। এটি যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক বর্ণনা প্রদানের দিকে অগ্রসরমান। এই অগ্রসরতা প্রযুক্তির কথা যেমন বলে তেমনি ঐতিহ্যের কথাও বলে। সেদিক থেকে ফোকলোর যেমন ঐতিহ্যকেন্দ্রিক তেমনি চলমান। চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাৎ গ্রামের সাথে ফোকলোর শব্দটিকে একচ্ছত্র করে না দেখে তত্ত্বালোকে ফোকলোরের প্রবণতাগুলোকে শনাক্তকরণের মাধ্যমে গবেষণা প্রয়োজন।

তার মানে এই নয়, গ্রামকে অবজ্ঞা করে। বরং ফোকলোরের এক বিশাল অংশ গ্রামকেন্দ্রিক। 'নাগরিক' শব্দের বিপরীতে 'গ্রামীণ' শব্দটি বিভাজনমূলক কিছু বোঝালেও এই বিভাজন প্রত্যক্ষ। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীই আধুনিকতার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যেই নগরে পাড়ি জমিয়েছে, বসতি স্থাপন করেছে। আবার অনেকেই গ্রামে রয়ে গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সমাগম ঘটায় নগরের জনগোষ্ঠী কোনো সংহত সত্তা নয়। কোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বলয়েও তারা আবদ্ধ নয়। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রিতরূপে এ যেন এক অখণ্ড পরিমণ্ডল। ভিন্ন সাংস্কৃতিক সত্তার মিলনমেলা যেন এই নগর। নগরে বসতি স্থাপন করে ব্যক্তি সত্তা শেকড় থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। নাগরিক মধ্যবিত্তের মন কোথায় যেন বারবার ফিরে যেতে চায় শেকড়ের কাছে। যেহেতু নগরে বসবাসরত একশ্রেণি গ্রাম থেকে এসেছে সেহেতু গ্রামীণ সংস্কৃতি কিছুটা হলেও তারা সাথে করে নিয়ে এসেছে। ঐতিহ্যে প্রথা, আচার, বিশ্বাস, উৎসব, প্রবাদসহ বিভিন্ন উপাদান। সেদিক থেকে নগরে উদ্ভব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যাশ্রিত ফোকলোর একই সাথে প্রবাহিত হচ্ছে নাগরিক মননে। কখনো দীর্ঘসময় অতিক্রান্তের ফলে তা অবিকৃত থাকছে না। কখনো-বা কিছু উপাদান একেবারেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কখনো সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে রূপান্তরিত রূপ হিসেবে নগরে টিকে রয়েছে। যদিও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক দশা। যার ফলে কালচারের কিছু উপাদান মাইগ্রেটেড হয়। এই মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ার ফলে নতুন সাংস্কৃতিক উপাদান যেমন যুক্ত হয় তেমনি বিযুক্ত হয়। নগরের নাগরিক মন সর্বদা শেকড়কে খুঁজে পেতে চায়। ফলে নাগরিক মঞ্চে ঐতিহ্যের পুনর্গঠন রূপ প্রায়শই দৃশ্যমান হয়। বর্তমান গ্রন্থটি আমার প্রায় ৪ বছরের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফল। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি উত্তর-আধুনিকতা প্রবণতার আলোকে ফোকলোরের তাত্ত্বিক ডিসকোর্স উপস্থাপন করার।

সূচি

প্রথম অধ্যায়
উত্তর-আধুনিকতা ও ফোকলোর ১৩
তাত্ত্বিক আলোচনা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফোকলোরের 'রিসাইকেল' : উত্তর-আধুনিকতার আলোকে পর্যবেক্ষণ ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়
প্লুরালিজম ও ফোকলোর ৬৩

চতুর্থ অধ্যায়
ফোকলোরিসমাস : বাঙালির লোক ঐতিহ্যের পরিগ্রহণ ও অভিযোজন ৮৩

পঞ্চম অধ্যায়
আরবান ফোকলোর চর্চার পরিসর ৯৯

ষষ্ঠ অধ্যায়
ই-ভার্সনকেন্দ্রিক বিকশিত ফোকলোর ১৫৩

সপ্তম অধ্যায়
নগরে ফোকলোরের পুনর্গঠন ও পরিবর্তন ২৩৩

প্রথম অধ্যায়

উত্তর-আধুনিকতা ও ফোকলোর তাত্ত্বিক আলোচনা

সভ্যতার পরিক্রমায় আবর্তনরত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একাধিক ধাপ পেরিয়ে বর্তমানে এসে উপনীত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসরমান। এই যাত্রাপথের ভেতরে ঘটে যাওয়া বিবর্তনের ধারাবাহিকতার ইতিহাসও কিন্তু মসৃণ নয়। তেমনি সভ্যতার আলোকবর্তিকা বিশ্বব্যাপী একই সময়ে ছড়িয়ে পড়েনি। বরং মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে এর প্রভাব চিন্তনশীল ব্যক্তিদের ভাবনার জগৎকে বহুমাত্রিক দিক দিয়ে ভাবিয়েছিল। সময়ভেদে যুগের বিভাজনে মতবাদের যেমন ঐক্য রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে মতবিরোধ। চেতনায় সময়ের অস্তিত্বকে অনুধাবন করা যায়। সময় বা কালখণ্ডের বিভাজিত প্রত্যেকটি অংশকে তাত্ত্বিকেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে নামকরণ করেছেন। মানববিদ্যা, সমাজবিদ্যা ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে পোস্টমর্ডানিজম (উত্তর-আধুনিকতা) ঠিক তেমনই একটি ধারণা। যে ধারণার উদ্ভব হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট কালপর্বের পরবর্তী সময় থেকে বর্তমানে চলমান এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত নতুন কোনো কালপর্বের পূর্ব অবধি। পোস্টমর্ডানিজম শব্দটির মাঝেই এর পূর্ববর্তী ধারণা বা কালপর্বটি রয়েছে। সেটি হলো মর্ডানিজম (আধুনিকতা)। পোস্টমর্ডানিজমে 'পোস্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে Prefix হিসেবে যার অর্থ 'পরে'। অর্থাৎ পোস্টমর্ডানিজম বলতে মর্ডানিজমের পরবর্তী কালপর্বকে বোঝায়। তবে মর্ডানিজম ধারণাকে বাতিল করেই পোস্টমর্ডানিজমবাদের আবির্ভাব ঘটে। মর্ডানিজম মানবসভ্যতার ধারাবাহিকতার ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাগুলোকে বহন করলেও পোস্টমর্ডানিস্টরা মর্ডানিজমের লক্ষণগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সেদিক থেকে পোস্টমর্ডানিজম নিয়ে আলোচনার পূর্বে মর্ডানিজম নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

মর্ডানিজম এমন এক সাংস্কৃতিক মুভমেন্ট ও মনোভঙ্গি যা চিরাচরিত ধারাকে উল্টে দিয়েছিল। মনোজগৎ ও সমাজসম্পর্কিত দূরত্ব ঘুচে গিয়ে

কোথায় যেন শিকড়চ্যুতের খেলায় মেতে উঠেছিল। তবে পরিবহন, যোগাযোগ, বিজ্ঞান, যুক্তির ক্ষেত্রে নব্য সজাগতা সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আধুনিকতা ও এনলাইটমেন্ট পাশ্চাত্যে যেভাবে আলোকবিচ্ছুরণ করেছিল, প্রাচ্যে করেছিল ভিন্নভাবে। ষোড়শ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ অবধি পাশ্চাত্য তথা ইয়োরোপীয় (ক্ষমতাধর) দেশগুলো তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনিবেশ স্থাপনের দিকে ধাবিত হয়। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাধর দেশগুলো সমগ্র বিশ্বে স্ব-নিয়ন্ত্রণ তথা আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। আধিপত্য বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকেই বুঝানো হচ্ছে না। বরং এই আধিপত্য ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রক্রিয়ায় অধিগ্রহণকৃত নয়াভূমিতে তথাকথিত সুগঠিত কিংবা পুনর্গঠনের নামে আরেক 'সমাজ গঠন' করা হয়, এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে বাণিজ্য, লুণ্ঠন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গণহত্যা, ক্রীতদাসত্ব এবং বিদ্রোহ (চৌধুরী:২০০৭:১)। এই আধিপত্য বিস্তারের দার্শনিক তত্ত্বকে কলোনিয়ালিজম বলে। আমরা যদি ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের বিষয়টি লক্ষ করি সেদিকে শাসক সম্প্রদায় কলোনি স্থাপনের পাশাপাশি এ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। কৃষিজাত পণ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প ও সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তারা শিক্ষা বিস্তারের অন্তরালে কোলাবোরেট শ্রেণি তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। অর্থনৈতিক বিভাজন, শ্রেণি বিভাজন, রাজনৈতিক মেরুকরণ, কানুনিক পক্ষপাতিত্ব, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির ধারা বিপরীত দিকে প্রবাহিত করা, অধিগত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার কলাকৌশলে ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণিরা ছিলেন সফল। কালচারাল হেজিমনি (সাংস্কৃতিক আধিপত্য) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে উচ্চতর সংস্কৃতি হিসেবে উপস্থাপন করে। অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, স্বসমাজ ও সংস্কৃতি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা। কেননা সংস্কৃতির বলয়ে যে মানবগোষ্ঠী তাদের আইডেনটিটি (আত্মপরিচয়) গড়ে তোলে সেই জায়গা থেকে তাদের অপসারণ করা হলে তারা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়বে। এই সমস্ত আধিপত্য বিস্তারকারী ডোমেইন তাদেরকে জাতি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা তৈরি করে দিয়েছিল। অর্থনৈতিক মুক্তির নামে অধীনস্ত মানবগোষ্ঠীদের ক্রমশ শৃঙ্খলবেষ্টিত করে রাখে। বলপ্রয়োগকৃত আধিপত্যের পাশাপাশি ছিল মানসিকভাবে আধিপত্য স্থাপনের কৌশল। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: ভাষা। ভাষা মানুষের চিন্তার জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারে। ভাষা এবং সংস্কৃতির দিকে থেকে অধীনস্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের কলোনাইজ করার মাধ্যমে তারা মনোজাগতিক কলোনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার তাদের চেতনায় হীনম্মন্যতার বীজকে অঙ্কুরিত করেছিল। বিখ্যাত ফরাসি মনস্তত্ত্ববিদ Frantz Fanon মনোজগতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক গবেষণা করেছেন। তন্মধ্যে Black Skin (1952), The Wretched of the Earth (1961), White Masks (1952) অন্যতম। কলোনিয়ালিম ডিসকোর্সের ক্ষেত্রে এডওয়ার্ড সাঈদের Orientalism (1978) গ্রন্থ কলোনাইজারদের মানসিকতাকে চিহ্নিত করেছেন।

পাশ্চাত্যের দেশগুলো সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার পথ ধরে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। সাধারণ অর্থে আধুনিকতা বলতে চলমানতা বা অগ্রসরমান অবস্থাকে বুঝানো হয়। দ্য রেনেসাঁ (নবজাগরণ)< দ্য রিফর্মেশন অ্যান্ড দ্য রিফর্ম (ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন)< দ্য এইজ অব এনলাইটম্যান্ট (আলোকায়নের যুগ)< দ্য এইজ অব রোমান্টিক (রোমান্টিক যুগ) < দ্য ভিক্টোরিয়া পিরিয়ড (ভিক্টোরিয়া যুগ)< আধুনিকযুগ। মুদ্রণ যন্ত্রের আবির্ভাব (The arrival of printing press), ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (The English Civil War), ১৮শ শতকে ফরাসি বিপ্লব (The French Revolution), আমেরিকান বিপ্লবের (The American Revolution), রুশ বিপ্লব (The Rusian Revolution), ১৮৪৮ সালের বিপ্লব (The Revolution of 1848), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (The First World War and Second World War) মাধ্যমে চিন্তন জগতে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইয়োরোপের সামাজিক কাঠামো পরিপূর্ণভাবে বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। ১৮শ শতকেই সমগ্র ইয়োরোপ জুড়ে শিল্প বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব এনলাইটমেন্ট (আলোকময়তা) ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমা বিশ্বে শিল্পবিপ্লবের ফলে বাণিজ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনেও এর প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। তবে ইয়োরোপের অধীনস্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের আশীর্বাদ অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। ইয়োরোপীয়রা তাদের শাসিত দেশগুলোর কাঁচামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে স্বদেশকে সমৃদ্ধ করেছিল।

শিল্পবিপ্লবের দরুন মুক্তবাজার অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হলো। যার ফলশ্রুতিতে ভূস্বামীরা সাধারণ জনগণের পূর্বপুরুষের জমি দখল করে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 'উনিশ শতকে শিল্পভিত্তিক নগরগুলোর উদ্ভব ঘটে, যা দ্রুত কোলাহলপূর্ণ, বহু অঞ্চলের বহু

সংস্কৃতির মানুষের সমন্বিত সমাজে পরিণত হয়। এই অবস্থাকেই ধনী ও ব্যবসায়ীর বিস্ফোরণ ও শ্রমিকের প্রান্তিকায়ন বা কোণঠাসা হিসেবে বর্ণনা করেন কার্ল মার্কস। এই অবস্থার পরিবর্তনে পুঁজিই নিয়ন্তা হয়ে উঠল, পুঁজিপতি ও অবস্থাসম্পন্ন মানুষ আরও ধনী হতে লাগল এবং আরও দরিদ্র হতে লাগল শ্রমিক শ্রেণি। অনেক কারখানায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে শ্রমিকেরা চাকরি হারাতে লাগল। এক সময় যেসব কারিগর নিজের ঘরে কাপড় বা গৃহস্থালি দ্রব্য উৎপাদন করত যেমন, গ্রাম পেশাভিত্তিক তাঁতি, কুমার, কামার-এরা চাকরির আশায় কারখানায় কাজ নিয়েছিল। মেশিন বসানো হলে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কারণে তারা পূর্বেও আত্মনির্ভর পেশা ও চাকরি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল' (রশীদ:২০১৯:১৫)।

বস্তুবাদী দর্শন, নব্য দর্শনে যুক্তির প্রয়োগ, প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে নতুন জ্ঞান আহরণ, প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য নিরূপণ অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইয়োরোপ থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী, ১৫০০-১৮০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। অনেকেই ১৮০০ শতক হতে বর্তমান অবধি সময়কে আধুনিক যুগ বলেছেন। অন্য বিবেচনায়, ইয়োরোপীয় সমাজের উপনিবেশের দিকে ধাবিত হওয়া এবং সেইসব অঞ্চল থেকে কাঁচামাল, দাস ও সাংস্কৃতিক সম্পদ এনে শিল্পায়িত নগরভিত্তিক সমাজ তৈরি করার সময়টিই আধুনিক যুগ। এ বিবেচনায় সতেরো থেকে উনিশ শতকে 'অ-ইয়োরোপীয় আধুনিক যুগ- এর সুবর্ণকাল (রশীদ:২০১৯: ১২) মামুন অর রশীদ (২০১৯), উত্তর-আধুনিকতা, সংবেদ, ঢাকা। সেদিক থেকে ১৯ শতকের শিল্পায়নকে আধুনিকতার প্রথম পর্ব এবং ২০ শতককে আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার অনেক ঐতিহাসিক ১৪৯২, অনেকে ১৫১৭ সালকে আধুনিকতার সূচনালগ্ন হিসেবে চিহ্নায়িত করেছেন। Modernity is a qualitative, not a chronological, category (Adorno:2005:218)

আধুনিক যুগের সূচনাকাল নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও আধুনিকতার টার্মগুলো ব্যাপকার্থে পরিবর্তন এনেছিল। তাই কালজ্ঞাপনের দিক থেকে আধুনিকতাকে বিবেচনা না করে তার ডাইনামিক (অগ্রসরমান) বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা আবশ্যক। 'আধুনিকতা হলো একটি অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রবাহমান এবং যার মাধ্যমে উদ্ভব হয় আধুনিকতাবাদের'— বারমেনের এই বক্তব্যটি সবার কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তিনি অভিজ্ঞতা বলতে বুঝিয়েছেন, আত্মউন্নয়ন ও আত্মবিস্তারলব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান সমাজ ও মনোজগতের দূরত্ব ঘোচাতে চায়। 'আধুনিকতার